দৈনিক খবর

তারিখ 28 OCT 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মতামত

বৃত্তিমূলক বাণিজ্যিক শিক্ষার কারিকুলামের প্রেক্ষাপট

ডঃ মোঃ শামসুল হক মিয়া

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের (১৯৫৯) সুপারিশের ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) সরকারের সাথে ইউএসএইড (USAID) এবং কলোরেডো স্টেট কলেজের সাথে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫-৬৭ সালে ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলো প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল দেশের সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর অফিসসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দক্ষ অফিস কর্মচারী সৃষ্টির নিমিত্তে এসএসসি পরীক্ষা পাস করার পর চাকরিপ্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সচিবী বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান এবং দপ্তর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উন্নতমানের বাস্তবভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারী এবং বৈদেশিক কূটনৈতিক মিশনগুলোর বিভিন্ন অফিসে চাকরির জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলে দেশের বিরাজমান বেকার সমস্যার কিছুটা লাঘব করা।

১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের জন্য যে কারিকুলাম প্রণীত হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ সাধারণ উদ্দেশ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য। সাধারণ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ (১) সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দক্ষ অফিস কর্মচারী যেমন অফিস সহকারী, স্টেনোগ্রাফার, ব্যক্তিগত সহকারী স্টেনো-টাইপিস্ট, টাইপিস্ট, অফিস সহকারী-কাম-টাইপিস্ট, হিসাব রক্ষক, ভাণ্ডার রক্ষক, ব্যক্তিগত সহকারী, অভ্যর্থনাকারী, টেলিফোন অপারেটর প্রভৃতি তৈরী করার জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান, (২) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো সম্পর্কে এবং বাণিজ্যিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানদান, (৩) জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্য অনুপ্রেরণা দান, (৪) জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্য প্রেরণা দান, (৫) অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উচ্চতর এবং আধুনিক জ্ঞানলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করা; এবং (৬) নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলা। আর বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ ছিলঃ (১) সাঁটলিপি, মুদ্রাক্ষর লিখন, হিসাব সংরক্ষণ, নথি সংরক্ষণ, ভাণ্ডার সংরক্ষণ এবং অফিস মেশিন অপারেশন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দান, (২) বাণিজ্যিক লেন-দেন এবং কারবার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানদান, (৩) ইংরেজী ও বাংলা পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা, (৪) অফিস পরিচালনার মৌলিক উপাদানগুলো সম্পর্কে জ্ঞানদান, (৫) শিক্ষা ও বাস্তব কর্মজীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা; এবং (৬) শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্বাচনে সহায়তা করা। কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের জন্য যে কারিকুলাম প্রণীত হয়, তখন তা উচ্চ মাধ্যমিক কোর্সের সমমানের বলে বিবেচিত হতো না। পরবর্তী বছর হতে অবশ্য তা এইচএসসি (কমার্স) কোর্সের সমমানের বলে বিবেচিত হতে থাকে। ওই সময় ডিপ্লোমা-ইন-কমার্সে সচিবী বিজ্ঞান বা হিসাব বিজ্ঞান বলে কোন বিভাগ ছিলো না। একজন শিক্ষার্থীকে একই সঙ্গে সচিবী বিজ্ঞান এবং হিসাব বিজ্ঞানের সকল কোর্সই অধ্যয়ন করতে হতো। তখনও দু' বছর মেয়াদী ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্স ৪টি সেমিস্টারে পড়ানো হতো। প্রতিটি সেমিস্টারের সময়কাল ৬ মাস।

১৯৭৩ সালের জুন মাসে ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্সের কারিকুলামের পরিমার্জন সাধন করা হয়। এ সময় এ কোর্সকে ৪টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ (১) হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ (ইংরেজী মাধ্যম)। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সকল কোর্স যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতো এবং তারা ইংরেজী টাইপ করতো। এদের প্রধান (Major) বিষয় ছিল হিসাব বিজ্ঞান। কিন্তু তাদের জন্য বাংলা টাইপ করা এবং কোন সাঁটলিপি পড়ার সুযোগ ছিল না, (২) হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ (বাংলা মাধ্যম)। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সকল কোর্স যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতো এবং তারা বাংলা টাইপ করতো। কিন্তু তাদের জন্য ইংরেজী টাইপ করা এবং কোনো সাঁটলিপি পড়ার সুযোগ ছিল না। এদেরও প্রধান (Major) বিষয় ছিল হিসাব বিজ্ঞান, (৩) ইংরেজী সচিবী বিজ্ঞান বিভাগ। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সকল কোর্স যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতো এবং তারা ইংরেজী টাইপ করতো। কিন্তু তাদের জন্য বাংলা টাইপ করা এবং বাংলা সাঁটলিপি পড়ার সুযোগ ছিল না। এদের জন্য অবশ্য দুই সেমিস্টার বুক-কিপিং পড়ার সুযোগ ছিল, (৪) বাংলা সচিবী বিজ্ঞান বিভাগ। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সকল কোর্স যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতো এবং তারা বাংলা টাইপ করতো। কিন্তু এদের জন্য ইংরেজী টাইপ করা এবং ইংরেজী সাঁটলিপি পড়ার সুযোগ কারিকুলামে ছিল না। এরা অবশ্য ইংরেজী সচিবী বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় দুই সেমিস্টার বুক-কিপিং পড়ার সুযোগ পেত।

১৯৭৩ সালের কারিকুলাম অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগের শিক্ষার্থীকে ৪টি সেমিস্টারে মোট ৮১ ক্রেডিট আওয়ার (Credit hour) সমাপ্ত করতে হতো। এর মধ্যে প্রথম সেমিস্টারে ২২ ক্রেডিট আওয়ার, দ্বিতীয় সেমিস্টারে ১৯ ক্রেডিট আওয়ার এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারে ২০ ক্রেডিট আওয়ার করে ৪০ ক্রেডিট আওয়ারের কোর্স ছিল। প্রতি ১টি তাত্ত্বিক ক্লাসের জন্য ১ ক্রেডিট আওয়ার এবং প্রতি ৩টি ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ১ ক্রেডিট আওয়ার ধরা হয়। এই কারিকুলামে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ক্লাসের অনুপাত ছিল ৪৪ঃ৫৬। ভাষা, বিশেষ করে মাতৃভাষা বাংলার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি এই কারিকুলামে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল বতে শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন নৈর্বাচনিক বিষয় ছিল না। অর্থাৎ একে বলা হতো একটি অনমনীয় (Rigid) কারিকুলাম।

১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের তৎকালীন ডীন ডঃ হাবিবুর রহমানকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের কারিকুলাম উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল। কমিটি এ ব্যাপারে বেশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক আওতা থেকে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক আওতায় চলে আসায় এ পদক্ষেপ আর বাস্তবায়িত হয়নি এবং কমিটি তার রিপোর্টও আর পেশ করেনি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ১৯৮৭ সালের ১৬ই মে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক দেশের কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোতে প্রচলিত ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্সের শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন ও এ কোর্সকে সময়োপযোগী করে সংশোধন করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক্তন পরিচালক (উচ্চ শিক্ষা) এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকীকে আহবায়ক করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। আমি নিজেও এ কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। পরে অবশ্য আরো দু'জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে কমিটির সদস্য সংখ্যা ৯ জনে উন্নীত করা হয়। কমিটি ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কারিকুলাম পরিমার্জন, সংশোধন এবং উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করে।

১৯৮৯ সালে প্রণীত ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্সের কারিকুলামের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীরা ১০০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয়সমূহের মধ্যে বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল, কারবার সংগঠন ও ব্যাংকিং, অফিস ব্যবস্থাপনা ও নথি সংরক্ষণ, ইংরেজী টাইপিং এবং বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন অধ্যয়ন করবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স, ইংরেজী সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স বহুভাষী সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স এবং একাউন্টি- এই চারটি নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ থেকে যে কোন একটি নৈর্বাচনিক বিভাগের ২০০ নম্বরের বিষয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদেরকে দু'বছর মেয়াদী চারটি সেমিস্টার সমাপন করে সর্বমোট (১০০০+২০০)=১২০০ নম্বর বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হবে। অবশিষ্ট ৩টি বিভাগে যে কোন একটি বিভাগকে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। অতিরিক্ত বিষয়ে ২০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে থেকে ৮০ নম্বর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নম্বর (যদি থাকে) পরীক্ষার্থীর মোট প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। এ নম্বর পরীক্ষার্থীর স্থান ও বিভাগ নির্ধারণে সহায়ক হবে। কিন্তু বৃত্তির ব্যাপারে এই অতিরিক্ত নম্বরের কোন সুবিধা পরীক্ষার্থী পাবে না। পরবর্তী সকল কারিকুলামে আভ্যন্তরীণ নম্বর ছিল ৫০% ভাগ। ১৯৮৯ সালের কারিকুলামে অভ্যন্তরীণ নম্বর রাখা হয়েছে ২৫% ভাগ। এ কারিকুলামের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্সের সকল বিভাগের শিক্ষার্থীরাই একই সঙ্গে ইংরেজী টাইপরাইটিং এবং বাংলা মুদ্রাক্ষর লিখন অনুশীলন করার সুযোগ পাবে, যার বিধান ইতিপূর্বে ছিল না।

ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কমিটির (১৯৮৯) প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে যে, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রস্তাবিত শিক্ষকদের জন্য অপরিহার্য। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত। কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের চার দেয়ালের ভিতর শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষে তাত্ত্বিক শিক্ষাদান করলেই এখন আর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বলে ভাববার কোন অবকাশ নেই। তাদের ব্যবহারিক শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে. চারটি পর্বের মধ্যে চতুর্থ পর্বের শেষের দিকে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী বা অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী অফিস-আদালতের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে অফিস ব্যবস্থাপনার বাস্তব জ্ঞানলাভ করা উচিত। এ পর্বে তাদের জন্য শিক্ষামূলক সফরেরও ব্যবস্থা করা উচিত।

কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহে শিক্ষাউপকরণের অভাব রয়েছে দারুণভাবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় প্রতিটি ইন্সটিটিউটে টাইপরাইটিং এবং ক্যালকুলেটিং মেশিনের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। ইন্সটিটিউগুলোর অধিকাংশ ক্যালকুলেটিং মেশিন এবং ইংরেজী টাইপরাইটার ১৯৬৫-৬৬ সালে কেনা হয়েছে এবং অধিকাংশ বাংলা টাইপরাইটার কেনা হয়েছে ১৯৭৩-৭৪ সালে। এ সুদীর্ঘকালে মেশিনগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক। পুরাতন ও অকেজো মেশিনের পরিবর্তে নূতন মেশিন আনা হয়েছে খুব কমই। এমনকি মেশিনগুলোর মেরামত ও সার্ভিসিং-এরও নেই কোন নিয়মিত বন্দোবস্ত। ডিকটাফোন ওভারহেড প্রজেক্টর, ফিল্ম প্রজেক্টর এবং স্লাইড প্রজেক্টর ব্যবহার করার ব্যবস্থা নেই কোনো কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটেই। একমাত্র ঢাকা কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে একটি ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরী থাকলেও তা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সুদীর্ঘকাল ধরে। কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর লাইব্রেরীতে নেই পর্যাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় বই।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি শিক্ষা প্রোগ্রামের প্রাণস্বরূপ। আর বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের সবচেয়ে উপেক্ষিত দিক হলো এর শিক্ষক প্রশিক্ষণ। নোলন এবং অন্যান্যরা (১৯৬৭) বলেছেন, কারিকুলাম যত সুপরিকল্পিতভাবেই প্রণয়ন করা হোক না কেন; পাঠ্যবই যত সুন্দরভাবেই লিখা হোক না কেন এবং শিক্ষাউপকরণ যত দামীই হোক না কেন, এসবকিছুই অর্থহীন হবে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ, উপযুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকেন। অথচ কি অবাক ব্যাপার, বিগত অর্ধ যুগেরও অধিককাল ধরে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স বন্ধ রয়েছে। ১৯৮৯ সালে প্রণীত এই ব্যাপকভিত্তিক কারিকুলাম বাস্তবে রূপদান করতে হলে আধুনিক শিক্ষাপোকরণ দ্বারা কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোকে সুসজ্জিত করতে হবে এবং পর্যাপ্ত দক্ষ, উপযুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক দ্বারা প্রতিটি কোর্সের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেহবে।

তবে ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্সের জন্য ১৯৮৯ সালে প্রণীত কারিকুলাম সুন্দর ও ব্যাপকভিত্তিক হলেও এতে আত্মতৃপ্তির কোনো অবকাশ নেই। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের যুগে বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত কোর্সের বেশ চাহিদা রয়েছে সে সমস্ত কোর্স যেমন- বীমা, বিপণন, বিজ্ঞাপন,

সেমিনারে যোগ দিতে এসেছে। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে বেশী সময় লাগল না। সে আমাকে বিশ্রাম নেবার সুযোগও দিল না। বলল, কালক্ষেপ করলে বিলাত দর্শন হবে না। সুতরাং সময় বয়ে যাবার আগেই যা পারি দেখেশুনে নিই, চলুন। তার এক বোন থাকে উইন্ডসরে। উইন্ডসর দুর্গে ইংল্যান্ডের রাণী অবকাশ যাপন করেন। মন্দ কি! ঘুরেই আসি।